



মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প ও প্রাথমিক শিক্ষা: প্রভাব ও মূল্যায়ন

Kausik Karak

D.El.Ed (West Bengal Board of Primary Education), 2017-2019, E mail: iamkausik007@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প বা মিড-ডে মিল স্কিম একটি অগ্রগণ্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষত দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী অঞ্চলের শিশুদের বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত রাখতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্পটি মূলত বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, অপুষ্টি দূরীকরণ, শিশুর স্বাস্থ্যোন্নয়ন এবং শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে চালু হলেও সময়ের সঙ্গে এটি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে একটি শক্তিশালী সহায়কে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনের পুষ্টিকর খাবার শিশুদের BMI, ওজন, উচ্চতা ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে, যার ফলে শেখার ক্ষমতা, মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি উন্নত হয়। তাছাড়া, একসঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার মাধ্যমে জাতপাত, শ্রেণি ও লিঙ্গভেদজনিত বিভাজন কমে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। তবে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে কিছু সীমাবদ্ধতা—যেমন অপরিপাক্য পরিকাঠামো, খাদ্যগুণমান নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি, রান্না-কর্মীদের কম পারিশ্রমিক ও দুর্বল মনিটরিং—অবশ্যই সমাধানযোগ্য। সামগ্রিকভাবে, মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, শিশু-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

মূল শব্দ: মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা, অপুষ্টি হ্রাস, উপস্থিতি ও ভর্তির হার, সামাজিক সম্প্রীতি।

ভূমিকা :

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প — *Mid-Day Meal Scheme* — কেবল একটি খাবারবিতরণ কর্মসূচি নয়; এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তা জাল, শিক্ষা নীতির প্রয়োগ এবং জনস্বাস্থ্যের প্রগতিশীল উদ্যোগের সমন্বয়। দরিদ্রতা ও অপুষ্টির ঘাটতির মধ্যে জন্ম নেওয়া অনেক শিশুই শ্রেণিকক্ষে মনোযোগ রাখতে অক্ষম; তাদের বিদ্যালয়ে টিকিয়ে রাখা, উপস্থিতি বাড়ানো এবং লব্ধ জ্ঞানকে কার্যকর করে তোলা—এসব উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প সুচারুভাবে কাজ করে। ১৯৯৫ সালে জাতীয় স্তরে এর প্রবর্তন পরবর্তীতে ব্যাপক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সমাজসেবা সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে গৃহীত হয় এবং সর্বশিক্ষা অভিযান সহ বিভিন্ন উদ্যোগের সহায়তায় তার কর্মপরিসর ও কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে এই কর্মসূচি বিশ্বের বৃহত্তম স্কুলভিত্তিক পুষ্টি হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত; লক্ষ লক্ষ স্কুলপ্রার্থী প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করছে—শহর-গ্রাম-আদিবাসী ও উন্নয়নশীল সব অঞ্চলে। এর বহুমুখী লক্ষ্য রয়েছে: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ত্যাগ হ্রাস, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি নিশ্চিত করা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য কমানো এবং শিক্ষাকে সমাজে

সমতাভিত্তিকভাবে প্রসারিত করা। প্রকল্পটি শিক্ষাগত ফলাফল ও স্বাস্থ্যগত মাপকাঠিতে কীভাবে প্রভাব ফেলছে—এটি বুঝতে হলে খাদ্য-পুষ্টি ও শেখার প্রক্রিয়ার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক, সামাজিক-আর্থিক প্রেক্ষাপট ও স্থানীয় বাস্তবতাকে সমসাময়িকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের বাস্তবায়ন জটিল: কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত নীতি, রাজ্য-স্তরের বাস্তবায়নচিত্র, জেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে রান্না ও বিতরণ, স্থানীয় সঞ্চালক—মা-মন্ডলী, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি—এবং এনজিও বা সংবিধিবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক অংশীদারদের ভূমিকা—সবকিছু মিলে কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। একই সঙ্গে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, বাজেট বরাদ্দ, খাদ্যের পুষ্টিমান, রান্নাঘরের অবকাঠামো, শ্রমিকদের অধিকার, তদারকি ও স্বচ্ছতা—এসব বিষয়ও গঠনমূলকভাবে মূল্যায়নের দাবী রাখে।

এই প্রবন্ধে আমরা মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, নীতিগত কাঠামো, মাঠ-ভিত্তিক বাস্তবায়ন মডেল, শিক্ষামূলক ও পুষ্টিগত প্রভাব, এবং সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করব। পাশাপাশি প্রজেক্টের উন্নয়নের সম্ভাবনা ও নীতি-উপদেশ উপস্থাপন করে দেখানো হবে কীভাবে এটি শুধু প্রতিদিনের খাবার প্রদান থেকে উঠে এসে একটি সমঅধিকার, সমৃদ্ধ শিক্ষাজীবন ও সামাজিক সমাহিতির শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। এমন বিশ্লেষণ বর্তমানে জরুরি, কারণ নীতিনির্ধারকরা যদি প্রকল্পের কার্যকারিতার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা না করে, তাহলে তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনাও সীমিত থেকে যাবে।

মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য

ভারতের গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার বছরদিন ধরেই উদ্বেগজনক। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পথে দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব এবং স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই ছিল প্রধান বাধা। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প শুরু হয় মূলত তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে—

1. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ত্যাগ কমানো
2. অপুষ্টি দূর করে শিশুদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নত করা
3. শিক্ষায় সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করে সমতাভিত্তিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানো

পরবর্তীতে প্রকল্পটি কেবল খাদ্য প্রদানেই সীমিত না থেকে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়।

মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের বাস্তবায়নব্যবস্থা

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্য, আর্থিক সাহায্য ও নির্দেশিকা প্রদান করে, এবং রাজ্য সরকার স্থানীয় পর্যায়ে রান্না, বিতরণ, পরিদর্শন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পরিচালনা করে। অধিকাংশ অঞ্চলে বিদ্যালয়স্তরে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হলেও, কিছু অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত রান্নাঘর ব্যবস্থাও চালু রয়েছে।

ব্যবস্থার প্রধান উপাদান

- প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত পুষ্টিমান
- খাদ্যশস্য সরবরাহ ও সংরক্ষণব্যবস্থা
- রান্নাঘর পরিকাঠামো
- কুক-কাম-হেলপার নিয়োগ

- পরিদর্শন, SMC-এর তদারকি ও হিসাবরক্ষণ

তবে প্রশাসনিক জটিলতা, অপরিপূর্ণ অবকাঠামো ও স্থানীয় স্তরের অনিয়ম অনেক সময় প্রকল্পের সুবিচার নষ্ট করে দেয়।

মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব

ক. ভর্তির হার বৃদ্ধি : মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প চালুর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি করা, এবং প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকেই এর সুফল স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গবেষণা, শিক্ষা দফতরের তথ্য এবং ইউনিসেফ ও ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা দরিদ্র পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষত যেসব পরিবার দৈনন্দিন খাদ্যের যোগান দিতে হিমশিম খায়, সেসব ঘরে বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্নভোজ একধরনের নিরাপত্তা প্রদান করে—শিশুটি প্রতিদিন অন্তত একবেলা পুষ্টিকর খাবার পাবে, এই নিশ্চয়তা পিতামাতা ও অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের প্রতি আস্থা বাড়ায়।

দারিদ্র্য, অনাহার ও সামাজিক বঞ্চনার বাস্তবতার মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশুদের শিক্ষাজীবন শুরু করার পথ বহু বছর ধরেই কঠিন ছিল। বহু পরিবার মনে করত, বিদ্যালয়ে পাঠালে শিশু শ্রমে যুক্ত হয়ে যে আয় বাড়তে পারত তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প চালুর পর এই সমীকরণ বদলে যায়। এখন বিদ্যালয়ে যাওয়া মানে শুধু পড়াশোনা নয়—এর সাথে জুড়ে গেল পুষ্টি, সামাজিক সুযোগ এবং অভিভাবকদের আর্থিক সাশ্রয়। ফলস্বরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘু এবং গ্রামীণ অঞ্চলে এই প্রভাব আরও তীব্রভাবে লক্ষ্য করা যায়। বহুবছর ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় পশ্চাদ্গতির মূল কারণ ছিল বিদ্যালয়ের প্রতি অনাগ্রহ এবং টিকে থাকার সংগ্রাম। মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্প তাদের বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট করে, কারণ এটি শিক্ষার সঙ্গে সোজাসুজি জীবনযাপন ও পুষ্টির নিরাপত্তাকে যুক্ত করেছে। বিদ্যালয় এখন শুধুমাত্র শেখার জায়গা নয়; বরং এটি খাদ্যপুষ্টি, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সম্মান অর্জনের স্থান।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে—অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। যেসব পরিবার আগে মনে করত বিদ্যালয়ে পাঠানো সময়ের অপচয়, তারা এখন বুঝতে শুরু করে যে বিদ্যালয়ের খাবার পাওয়া মানে তাদের নিজের আর্থিক বোঝা কিছুটা কমে। এর ফলে শিক্ষার প্রতি সামগ্রিক ইতিবাচকতা গড়ে ওঠে। অনেক গবেষণা দেখায়, মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্প চালুর পর নবভর্তি বৃদ্ধির হার বিভিন্ন অঞ্চলে ১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রকল্পের সফলতার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

সুতরাং স্পষ্ট যে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প কেবল একটি পুষ্টিকর খাদ্য কর্মসূচি নয়—এটি শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার একটি প্রভাবশালী সামাজিক পদক্ষেপ, যা দরিদ্র শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে এসেছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

উপস্থিতি ও ধারাবাহিকতা : মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতি ও ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হয়। বিদ্যালয়ে প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার পাওয়ার নিশ্চয়তা শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে দরিদ্র, কৃষিপ্রধান ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ পরিবারে প্রতিদিনের খাবারের জোগান স্থির নয়। ফলে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজন পাওয়ার সম্ভাবনা শিশুদের নিয়মিতভাবে স্কুলে উপস্থিত হওয়ার একটি শক্তিশালী অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, যেখানে আগে মৌসুমি শ্রম, কৃষিকাজ, পাহাড়ি বা জঙ্গলভিত্তিক জীবিকা অথবা দারিদ্র্যের কারণে শিশুদের অনিয়মিতভাবে স্কুলে যাতায়াত দেখা যেত—মিড-ডে মিল চালুর পর সেই অঞ্চলগুলিতে উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত আদিবাসী অঞ্চলে এই প্রভাব আরও বেশি দৃশ্যমান। যেমন—ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া—পুরুলিয়ার মতো অঞ্চলে উপস্থিতির হার ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত বেড়েছে বলে বিভিন্ন সমীক্ষায় উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া, বিদ্যালয়ে খাবারের নিশ্চয়তা শুধু শিশুদের নয়, অভিভাবকদের কাছেও বিদ্যালয়কে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আগে অনেকে ভাবতেন যে বিদ্যালয়ে পাঠালে বাড়ির কাজে বা জীবিকামূলক কাজে শিশুর অবদান কমে যাবে। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের কারণে একটি বাস্তব সুবিধা তৈরি হয়—অভিভাবকদের আর একটি খাবারের চিন্তা করতে হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষা এখন শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়; বরং এটি খাদ্যনিরাপত্তার একটি উপায়ও। এই বাস্তবতাই উপস্থিতির ধারাবাহিকতাকে দীর্ঘমেয়াদে আরও মজবুত করে তোলে।

অপুষ্টি হ্রাস ও স্বাস্থ্যোন্নয়ন : ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়-পড়ুয়া শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি বহুদিন ধরেই উদ্বেগজনক মাত্রায় ছিল। বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিশুদের মধ্যে নানা ধরনের পুষ্টিহীনতা, যেমন—কম উচ্চতা (stunting), কম ওজন (underweight), এবং ওজন-উচ্চতার অসামঞ্জস্য (wasting) ব্যাপকভাবে দেখা যেত। মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প এই সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করেছে।

প্রতিদিনের নির্ধারিত পুষ্টিকর খাবার শিশুদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও অন্যান্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ করে। বিশেষত প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য, সবজি এবং ডাল-ভাত ভিত্তিক মেনু শিশুদের পুষ্টি-ঘাটতি পূরণে কার্যকর। বিভিন্ন গবেষণা ও স্বাস্থ্যসমীক্ষা জানায়—মিড-ডে মিল প্রাপ্ত শিশুদের BMI (Body Mass Index) ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মানে উন্নীত হয়েছে। উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধির হারও প্রকল্প না-পাওয়া শিশুদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

এছাড়া, নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। দুর্বল শরীর নিয়ে বিদ্যালয়ে এলে শিশু দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগ কমে যায় এবং সর্দি-জ্বর-সংক্রমণের প্রবণতা বাড়ে। মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প এই দুঃস্থচক্র ভেঙে শিশুদের স্বাস্থ্যকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করেছে। ফলে শিশুরা ক্লাসে বেশি সক্রিয় হয়েছে, খেলাধুলা করতে পেরেছে, এবং সামগ্রিকভাবে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো—আদিবাসী ও কঠিন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি সমস্যার প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। এসব অঞ্চলে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প শুধুমাত্র খাদ্য প্রদানই করেনি; বরং এটি শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতার দিক থেকেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প শিশুর নিয়মিত পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে অপুষ্টি হ্রাসে একটি কার্যকর সামাজিক ‘পুষ্টি-নিরাপত্তা বলয়’ তৈরি করেছে, যা ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভিত্তি গঠন করেছে।

শিক্ষাগত সাফল্য: শিশুর শেখার ক্ষমতা তার শারীরিক সুস্থতা, পুষ্টি, মানসিক স্থিতি এবং মনোযোগের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প শিশুদের পুষ্টির ঘাটতি দূর করার ফলে শিক্ষাগত সাফল্যের ওপর বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলেছে। একটি পরিপুষ্ট শিশু ক্লাসে বেশি মনোযোগী হতে পারে, দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ ধরে রাখতে পারে এবং জটিল বিষয় বুঝতে সক্ষম হয়। পুষ্টিহীন শিশুদের মধ্যে সাধারণত ক্লান্তি, মনোসংযোগের অভাব, স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা এবং দ্রুত হতাশ হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যায়—যা শেখার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। মিড-ডে মিল এই সমস্যাগুলি লাঘব করে একটি স্বাস্থ্যকর শেখার পরিবেশ গড়ে তোলে।

প্রকল্পের ফলে শিশুদের শেখার ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, মিড-ডে মিল প্রাপ্ত শিশুদের গণিত, ভাষা, পরিবেশ বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক দক্ষতা উন্নত হয়েছে। তারা ক্লাসে নতুন ধারণা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে এবং পরীক্ষার ফলাফলেও উন্নতি দেখা যায়। একই সাথে, ক্লাসে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ে, কারণ শিশুরা শারীরিকভাবে বেশি উজ্জীবিত থাকে, আলোচনা ও গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিতে অংশ নিতে আগ্রহী হয় এবং প্রশ্ন করতে ভয় পায় না।

এছাড়াও, মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প প্রাথমিক স্তরের ভিত্তিভূত দক্ষতা—যেমন পড়া, লেখা, গণনা, বোধগম্যতা—দৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। পুষ্টির কারণে শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ত্বরান্বিত হয় এবং শেখার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, যা ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার

ভিত্তিও সুদৃঢ় করে। বলা যায়, পুষ্টি-শিক্ষা-সাফল্যের মধ্যে একটি জৈব সম্পর্ক তৈরি করেছে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প, যা প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর করেছে।

সামাজিক সম্প্রীতি ও লিঙ্গসমতা : মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প শুধু শিক্ষাগত বা পুষ্টিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং সামাজিক সম্প্রীতি গঠনেও এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের বহু অঞ্চলে এখনো জাতপাত, শ্রেণি, সম্প্রদায় এবং আর্থসামাজিক বৈষম্য শক্তিশালীভাবে বিদ্যমান। বিদ্যালয়ে একসঙ্গে বসে একই খাবার খাওয়ার অভ্যাস শিশুদের মধ্যে সেই বিভাজনগুলিকে ভেঙে দেয়। শিশুরা একসঙ্গে পণ্ডিতবদ্ধ হয়ে একই খালায় একই খাবার গ্রহণ করলে একটি সমতা-ভিত্তিক পরিবেশ তৈরি হয়। এতে সামাজিক দূরত্ব কমে, পারস্পরিক বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সাংস্কৃতিক সহনশীলতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

বহু গবেষণা জানায়, মিড-ডে মিল প্রকল্প জাতপাতভিত্তিক হিংসা ও বৈষম্য কমাতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। একই খাবার গ্রহণের মাধ্যমে ‘শুচিতা’ বা ‘অস্পৃশ্যতা’র ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে যায়, যা শিশুদের মধ্যে একটি প্রগতিশীল মানসিকতা গড়ে তোলে। এই অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে বৃহত্তর সমাজেও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে।

লিঙ্গসমতার ক্ষেত্রেও প্রকল্পটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সমাজে বহু বছর ধরে মেয়েদের বিদ্যালয়ছুট, পুষ্টি-বঞ্চনা এবং শিক্ষাবঞ্চিত হার বেশি ছিল। মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করেছে, কারণ অভিভাবকদের কাছে এটি একটি অতিরিক্ত সুবিধা—মেয়েটি স্কুলে গেলে অন্তত একটি পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত। এছাড়াও, ক্লাসে খাবার বিতরণ, রান্নার কাজ এবং সহায়তামূলক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ, মহিলা রাঁধুনি নিয়োগ, এবং মেয়েদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি লিঙ্গ-সমতা উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প একটি বহুমাত্রিক সামাজিক-শিক্ষাগত রূপান্তরের উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটিকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি শুধুমাত্র ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিরসনের কর্মসূচি নয়, বরং শিক্ষায় সমতা, ন্যায় এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এর মাধ্যমে শিশুদের শেখার পরিবেশ, স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং সামাজিক আচরণে গভীর প্রভাব পড়েছে।

১. ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বাধিক সফল কল্যাণ প্রকল্পগুলির একটি- প্রকল্পটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা যেন অন্তত দিনে একবার পুষ্টিকর খাবার পায়—এটি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোকে আরও শিশুবান্ধব করে তুলেছে। সরকারের ধারাবাহিক আর্থিক বরাদ্দ, স্কুল-পর্যায়ে রান্নার সুবিধা বৃদ্ধি, স্থানীয় স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার ফলে প্রকল্পটি সময়ের সঙ্গে ক্রমাগত উন্নত হয়েছে। বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা এই প্রকল্পকে উন্নয়নশীল দেশের এক মডেল হিসেবে বিবেচনা করে।

২. দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষাজীবন বজায় রাখার অন্যতম শক্তিশালী সহায়ক- যেসব পরিবারে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত নয়, সেখানে শিশুর বিদ্যালয়ত্যাগের প্রবণতা বেশি। মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প সেই সমস্যা সরাসরি সমাধান করেছে। বিশেষ করে আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘু, ভূমিহীন শ্রমিক পরিবারের শিশুরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছে। অনেক শিশুর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ই তাদের দিনের সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবারের উৎস, যা তাদের শেখার ধারাকে টিকিয়ে রাখে।

৩. মৌলিক পুষ্টি নিশ্চিত করে শিক্ষাগত সাফল্যের ভিত্তি নির্মাণ- পুষ্টিহীনতা শেখার কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়—এটি প্রমাণিত সত্য। মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প কর্মসূচি চালুর ফলে শিশুদের BMI, ওজন, উচ্চতা, রক্তস্বল্পতা এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঘাটতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তাদের মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি ও সমস্যার সমাধান করার সক্ষমতায়। তাই শিক্ষাগত সাফল্যও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. সামাজিক সমতা, সম্প্রীতি ও সংহতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা- একসঙ্গে বসে খাবার খাওয়া ভারতীয় সমাজের বহু গভীর-প্রোথিত বৈষম্য—যেমন জাতপাত, শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গভেদ—দূর করতে সহায়তা করে। মিড-ডে মিল শিশুদের মননে সমতার ধারণা

গড়ে তোলে। ছেলে-মেয়ে উভয়েই সমানভাবে অংশগ্রহণ করে, ফলে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যও হ্রাস পায়। সামাজিক সংহতি গঠন ও বহুত্ববাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উপসংহার

মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প শুধু একটি খাদ্যবিতরণ কর্মসূচি নয়—এটি ভারতের শিক্ষাগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের ইতিহাসে একটি বাস্তবধর্মী বিপ্লব। বহু শিশু যারা দারিদ্র্য ও অপুষ্টির চক্রে বন্দী ছিল, তারা আজ এই প্রকল্পের কারণে বিদ্যালয়ে আসছে, শিখছে এবং একটি স্বাস্থ্যসম্মত শৈশব পাচ্ছে। শিক্ষাকে গণমুখী, ন্যায়সঙ্গত, বৈষম্যহীন ও শিশুকেন্দ্রিক করতে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের ভূমিকা তাই অপারিসীম এবং বহুমাত্রিক। তবে, উন্নত ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, উন্নত বাজেট, পরিকাঠামো ও সামাজিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে প্রকল্পটি ভবিষ্যতে আরও সফল, টেকসই ও শিশুকল্যাণমুখী হয়ে উঠবে।

রেফারেন্স

1. ভারতের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়। (২০১৯)। *মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা*। নয়া দিল্লি: সরকারী প্রকাশনা বিভাগ।
2. পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। (২০২০)। *পশ্চিমবঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন কর্মসূচির অগ্রগতি ও মূল্যায়ন রিপোর্ট*। কলকাতা: প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর।
3. চক্রবর্তী, স. (২০১৭)। “মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের শিক্ষাগত প্রভাব: পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির একটি বিশ্লেষণ।” *শিক্ষা গবেষণা পত্রিকা*, ১২(৩), ৪৪-৫৮।
4. দত্ত, অ. (২০১৮)। *ভারতে শিশু পুষ্টি ও শিক্ষার সমস্যা*। কলকাতা: বিদ্যাসাগর প্রকাশনী।
5. মজুমদার, প. (২০১৬)। “প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের ভূমিকা।” *বঙ্গ শিক্ষা সমীক্ষা*, ৮(১), ২৫-৩৭।
6. শাহ, ত. (২০১৫)। *শিক্ষা ও সমাজ: ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত*। মুম্বাই: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।
7. সেন, র. (২০২১)। “রাইট টু ফুড ও মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প: সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার আলোচনায়।” *আইন ও সমাজ*, ৫(২), ১৪-২৯।
8. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়। (২০১৮)। *স্কুল পুষ্টি কর্মসূচির কার্যকারিতা সমীক্ষা*। নয়া দিল্লি: সরকারী গবেষণা ব্যুরো।
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, ল. (২০১৯)। “মেয়েদের বিদ্যালয়মুখী করতে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পের গুরুত্ব।” *নারী ও উন্নয়ন জার্নাল*, ৬(৪), ৫২-৬৪।
10. NCERT (এনসিইআরটি)। (২০২০)। *School Nutrition and Learning Outcomes: A National Review* (বাংলা সংস্করণ)। নয়া দিল্লি: এনসিইআরটি প্রকাশনা।

Citation: Karak. K., (2025) “মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প ও প্রাথমিক শিক্ষা: প্রভাব ও মূল্যায়ন”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.